কবি যখন ঔপন্যাসিক

কবি আত্মলীন মানুষ, নিজের মনের গহনে ডুব দিয়ে তিনি অমৃত আহরণ করেন। আত্মরতি-তৃপ্ত কবিমন সাধারণতঃ গল্প উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়। কারণ কথা সাহিত্যিকের দৃষ্টি বহির্জগতে স্বতঃপ্রসারিত হওয়া চাই। জগৎ ও জীবনে যা ঘটে বা ঘটেছে, বিশ্লেষণী দৃষ্টিতে তা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অনুধাবন করা এবং আকর্ষণীয় ভাবে প্রকাশ করা কথা সাহিত্যিকের কাজ। কবির মন সুদূর প্রসারী, শান্ত ও অনন্তের মধ্যে, ঘরের মাটির প্রদীপ ও আকাশের তারার মধ্যে মিলন ঘটানো তাঁর সাধনা। বস্তুগত তথ্যকে অতিক্রম করে কবির প্রবণতা ভাবসত্য প্রতিষ্ঠার দিকে, এই মনোভঙ্গি সার্থক কথাসাহিত্যিকের পথে অন্তরায়। রবীন্দ্রনাথ এর ব্যতিক্রমী শিল্পী। কবিমনটিকে সামনে রেখে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বনাট্যগুলি বিশ্ববন্দিত। কিন্তু সেগুলি যতখানি নাটক, ততখানি কাব্য। রবীন্দ্র-কথাসাহিত্যেও কবি মানসের প্রভাব লক্ষ্যণীয়। উপন্যাস সাহিত্যের আধুনিক শ্রেণী। উপন্যাসের ক্ষেত্রে কবিরস্থান সঙ্কীর্ণ। জগৎ ও জীবনের জটিলতা এবং দ্রুত গতি থেকে আধুনিক সভ্যতার লীলা বৈচিত্র্যের ভিতর এর উন্মেষ। কবি রবীন্দ্রনাথ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন স্থান গ্রহণ করেছেন। সে ক্ষেত্রে কথাসাহিত্যিক হয়তো বাঙালির স্বাভাবিক বৈচিত্র্যহীন জীবনের আকস্মিক উদ্বেল মুহূর্তগুলিকে বেছে নিয়ে কবি মনের আলোকে উজ্জ্বল করে বিচিত্রিত করেছেন। উপন্যাসের বাস্তব প্রধান পটভূমিতে কবি-আত্মা উদ্ভাষিত থেকে বস্তুজগৎ ও ভাবজগতের সার্থক সমণ্বয় সাধন করেছে। টমাস হার্ডি এই প্রতিভাকে রসিক সমাজের অভিনন্দনযোগ্য বলে মন্তব্য করেছেন।[১] রবীন্দ্র-উপন্যাসে কবি-আত্মার প্রাধান্য অনেক সমালোচককে বিব্রত করেছিল। তাঁদের মতে, রবীন্দ্র-উপন্যাস প্রকরণ অথবা বিষয়ে বা কৌশলগুণে যথার্থ উপন্যাস হয়ে উঠতে পারেনি। রবীন্দ্র-প্রতিভার বিকাশ যে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যমে ঘটেছিল তার সামগ্রীতে কবি-আত্মা প্রাধান্য পেয়েছে। শিল্প বিচারে চিরাচরিত, যথার্থ অথবা জ্যামিতিক মানদন্ড একমাত্র নয়, 'অন্তরের সত্য' অথবা 'ভাবের প্রকাশ' শিল্প-এষণাতে নতুন প্রকরণের সৃষ্টি করে। প্রবন্ধ, পত্র সাহিত্য, চিত্রকলা প্রভৃতি প্রতিটি স্তরেই রবীন্দ্র-ঈষিকা বৈচিত্র্যের সৃষ্টি করেছে। যে সমালোচকেরা রবীন্দ্র-উপন্যাসের স্খলন প্রত্যক্ষ করেছেন কাব্য ভাবের কারণে — প্রসঙ্গতঃ সেই কবি মানসিকতা উপন্যাসের ভিন্ন শ্রেণী এবং কবিত্বের ঐশী শক্তিকে উপন্যাসের বস্তুময়তায় একাত্ম করে দিয়ে তার নান্দনিক দিক তুলে ধরেছে, বিষয়ের উপস্থাপন, চরিত্র-নির্মিতি, ভাষাপ্রাণ, প্রকৃতির চিত্রণ এবং রূপ-কৌশলের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথের কবি আত্মা উপন্যাসকে স্বতন্ত্র পথে চালিত করেছে।

E. M. Forster মন্তব্য করেছেন I do not wonder that the poets despise it, though they sometimes find themselves in it by accident. And I am not surprised at the annoyance of the historian where by accident it finds itself among them.[২] ফরস্টারের অভিমত কবিরা ঔপন্যাসিকদের ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখেন। যদিও কবির দল অল্পবিস্তর রসোত্তীর্ণ উপন্যাস সৃষ্টি করে থাকেন। ঐতিহাসিকরাও কখনো কখনো উপন্যাস রচনা করে ফেললে সম্ভবত বিরক্তির ফাঁদে জড়িয়ে পড়তেন। অনেক সময় এই তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে রবীন্দ্র-উপন্যাসের সমালোচকদের কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেন - অনন্য কাব্য প্রতিভার অধিকারীর পক্ষে অভিব্যঞ্জনাময় উপন্যাস রচনা করা অসম্ভব। টি. এস. এলিয়ট মন্তব্য করেছেন যে কবি ও কথাশিল্পী যখন একই ব্যক্তি তখন তাঁর প্রতিভার সক্রিয় দিকটি অন্য সত্তাকে অবদমিত করে আত্মপ্রকাশ করে। ফরস্টার 'Acpects of the Novel' গ্রন্থে জানিয়েছেন, ঔপন্যাসিকের একদিকে কাব্যের প্রবাহ, অন্যদিকে ইতিহাসের মসৃণতা-এর সংমিশ্রণ উপন্যাসের ক্ষেত্রে এক অপ্রাকৃত ঘটনা। 'নষ্টনীড়', 'চোখের বালি', 'গোরা', 'চতুরঙ্গ', 'শেষের কবিতা' প্রভৃতি চরম উৎকৃষ্ট শিল্পরূপের স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ তাই ইতিহাসে কোন অপ্রাকৃত

ব্যতিক্রমী ঘটনা নয়, সাহিত্যের বিচিত্র, বিস্তৃত রাজপথে বহুমুখী সৃজনী প্রতিভার এ এক স্বাভাবিক আত্মপ্রকাশ।

উপন্যাস সর্বগ্রাহী, শিল্পী মাত্রেই জানেন, অন্তরমুখীনতা বা হৃন্ময়তা কবিতার বিষয় তার দ্বন্দ্বময় ব্যক্তিত্ব নাটকের বিষয়মূল, কিন্তু একই সঙ্গে যে, সেই হৃন্ময়তা ও দ্বন্দ্বময়তাকে তিনি যখন সামগ্রিক মানুষের সম্পর্কে সূত্রে গ্রথিত করে দেখাতে চান তখনি উপন্যাসের অগ্রাধিকার। এই উদ্দেশ্যেই 'The novelist has been quicker than the poet or the philosopher to borrow their specialities , than they have to borrow his ' শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকার সর্বত্রচারী। দর্শন, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতির প্রভাব এবং কবিত্ব, নাট্যরস এবং কাহিনিরস অর্থাৎ মানব মনীষা ও সাহিত্যশিল্পের শ্লাঘা — সবকিছু থেকেই উপন্যাস ঋণী হতে পারে। 'রূপশিল্প' (১৯৩৬) প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ জানালেন, 'প্রত্যেক কলার স্বাতন্ত্র্য আছে, আছে বলেই পরস্পরকে আতিথ্য দেবার পথ তারা কৃপণের মত অবরুদ্ধ করে রাখেনি'। তাই ঔপন্যাসিককে যেমন সর্বরসসিদ্ধ হতে হয় তেমনি উপন্যাস-পাঠককেও হতে হয় সর্বরস-ভোক্তা। মূললক্ষ্য পাঠকের কল্পনাকে আকৃষ্ট করা। বস্তুত বাস্তব জীবনের যে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে রোমান্টিকতার জন্ম, উপন্যাসের দীর্ঘ প্রতিবেশে কবিত্ব অঙ্গীভূত হয়েছে সে অসম্পূর্ণতার যন্ত্রণা থেকে। ভিক্টোরীয় যুগের প্রকল্পের অন্তরালে ছিল এই অসম্পূর্ণতার বোধ। ডিকেন্স সেই যুগের রোমান্টিকতা-বিরোধী প্রতিনিধি স্থানীয় লেখক। ওয়ার্ডস ওয়ার্থ-এর মত শান্ত কিংবা শেলীর মত ঝঞ্ঝাঘন প্রকৃতি ডিকেন্সের বিষয় নয় ; তিনি এ যুগের আত্মাকে অনুসন্ধান করেছিলেন। কাজেই এ কবিত্ব ভিক্টোরীয় যুগের মুখবন্ধ নয় বরং এলিজাবেথানদের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত বলা যায়। Poetic fantasy -র ব্যবহার স্বচ্ছ হাস্যরসের প্রয়োগে ডিকেন্সের কবি প্রতিভা তাঁর উপন্যাসকে অনন্য মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করেছে। ডিকেন্সের কবিত্ব উপন্যাস অতিরিক্ত কোন ব্যাপার নয়, বরং বলা যেতে পারে সমগ্র উপন্যাসের আত্মাতে এই কাব্যশ্রীর অধিষ্ঠান। জর্জ ইলিয়টের ক্ষেত্রেও এই কবি-কল্পনা দৃষ্টান্ত হয়ে আছে।

কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-বন্দিত এবং তাঁর শিল্পের ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণে কবিত্বের ঐশ্বর্য সর্বজনবিদিত। রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব শক্তি গুরুত্ব পেয়েছে কথা সাহিত্যে — একথা ঠিক নয়। তত্ত্ব লিরিকের প্লাবন এবং সৌন্দর্যের একাত্মতায় রবীন্দ্র-নাটক স্বতন্ত্র পথ খুঁজে নিয়েছে। একই ভাবে উপন্যাসের কবিত্ব সর্বোত্তম কবিত্বের অধিকারী বলে নয়, ডিকেন্স-ইলিয়টের মত কোন কালের প্রভাবে নয়, সাহিত্যের সামগ্রিকতার রসময়তায় ব্যাপৃত । ১৯২৮-এ 'How I Learn to write' প্রবন্ধে গোর্কি সৃজনক্ষম হাতিয়ারের শ্রেণীকরন করেছেন — একটি 'জ্ঞান', অপরটি 'কল্পনা'। প্রাকৃতিক অবস্থা এবং সমাজের বিভিন্ন পর্যায়কে বীক্ষণ করার দক্ষতা যার সাহায্যে জন্মে তারই নাম 'জ্ঞান'। 'জ্ঞান' হচ্ছে 'চিন্তন'। 'কল্পনা' যদিও একধরনের 'চিন্তন' কিন্তু এক্ষেত্রে চিন্তার প্রকাশ ইমেজে। রবীন্দ্র-উপন্যাস এই কল্পনার সূত্র ধরে তথ্য, প্রতিবেশ, সমাজ, চরিত্র, ভাষা প্রভৃতিকে দোহন করে তুলে ধরেছে উপন্যাসের ভিন্ন প্রকাশ — সেখানেই তাঁর স্বতন্ত্র কবিত্বের ঠিকানা।

কবিত্বের খোঁজ : ১২৮৮-র ফাল্গুনে 'চন্ডিদাস ও বিদ্যাপতি' প্রবন্ধে 'কবিত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বললেন — নিজের প্রাণের মধ্যে পরের প্রাণের মধ্যেও প্রকৃতির মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলে কবিত্ব। ভারতীয় আলঙ্কারিকেরা লোকোত্তর চমৎকার ব্রহ্মাস্বাদ সহোদর রসকে বলেছেন আত্মসংবিতের চর্বণা। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন — 'এই কাব্যরস কি তাহা বলা শক্ত। কারণ তাহা তত্ত্বের ন্যায় প্রমাণযোগ্য নহে, অনুভবযোগ্য।' কাব্যের মধ্যে মানুষ আত্মপ্রকাশের পথ খুঁজে পায় এবং কাব্যে মানুষ নিজেকেই বিশেষভাবে জানে বলে কাব্য অনুভব যোগ্য। সাহিত্যের উৎস সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র সহ পূর্বাপর পাশ্চাত্তের আচার্য গণও সহমত পোষন করেন। চিরন্তন সৃষ্টিকর্ম বাস্তবের প্রতিচ্ছবি নয়, তার সঙ্গে যে বস্তু জগতের সীমানার উর্দ্ধে, শিল্পীরসেই মনের মাধুরী, তার সঙ্গে। সংশ্লেষণ ঘটালেই

যথার্থ সাহিত্যের জন্ম হয়। রবীন্দ্রনাথও মনে করেন, এই অলৌকিক বস্তুই সাহিত্যের প্রান, তার চিরন্তনত্বের কবচ-কুন্ডল। অনেক আধুনিক উপন্যাসে প্রাত্যহিকজীবনের হাসিকান্না, রাগ-অনুরাগে সংক্ষুব্ধ, সদা পরিবর্তনশীল সমাজের বস্তুনিষ্ঠ প্রতিচিত্র নিপুণভাবে বিবৃত হলেও গভীরতার অভাবে জীবনসত্যের একটা চিরন্তন আভাস তার মধ্যে সচরাচর পাওয়া যায় না। টমাস হার্ডির মতো ঔপন্যাসিদের অন্যতম শ্রেষ্ঠজীবন শিল্পীর সৃষ্টিকর্ম ই. এম. ফরস্টার পর্যালোচনা করে বলেছেন -''his novels are surveys,.....it is talk never song.'' প্রসঙ্গটি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্যের প্রাণ' প্রবন্ধে নিজস্ব শিল্পরীতিতে ব্যক্ত করেছেন। যে রসবস্তু মানব-মানবীর অন্তরের গভীরতম স্তরে একই রূপে স্থিত, 'যে সৌন্দর্য মানুষের ভালোবাসার মধ্যে চিরকাল বদ্ধমূল, যার শ্রান্তি নেই, তৃপ্তি নেই,' সেই চিরঞ্জীব বস্তুই সাহিত্যের প্রাণ। রবীন্দ্র-উপন্যাস সেই রসবস্তুর সন্ধান দেয় — যেখান থেকে কবিত্ব ক্ষরিত, তার ঐশ্বর্যে স্বতন্ত্র পথ নির্মিত হয়। প্রতিটি শিল্পকর্মকে কবি বলেছেন 'শব্দার্থময় কথাবস্তু'। সাধারণ ভাবে একে বলা হয় রসবস্তু। এর উপাদান বাচ্য, রীতি, ছন্দ, অলঙ্কার প্রভৃতি নানা বস্তু সকলের সুষম রূপকল্পে এই বস্তুর অবয়ব গঠিত। কিন্তু শুধু নানা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের মিলনে যেমন প্রাণের সৃষ্টি হয় না প্রান শক্তিই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সৃষ্টি করে নিজেকে তার মধ্যে প্রকাশ করে, 'তেমনি রসই নিজেকে মূর্ত করে তোলার আবেগে এই সব অঙ্গের সৃষ্টি করেছে'৩। রবীন্দ্রনাথ এখানে প্রকারান্তরে পরমব্রহ্মের ঔপনিষদিক ভাষ্যের কথাই বলেছেন। এই চেতনাচেতন জগৎ পরমাত্মা ব্রহ্ম নয়, কিন্তু তিনি তা থেকে ভিন্নও নন, এ সবের মধ্যেই তিনি পরিব্যাপ্ত। সাহিত্যকর্মের সঙ্গে তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ঐ একই সাদৃশ্য এবং সামঞ্জস্য। এই সামঞ্জস্যে রবীন্দ্র-উপন্যাস নান্দনিক।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদের ঔপন্যাসিকেরা অন্তত যাঁরা পরিচর্যাশীলতায় বৃহৎ পাঠক সমাজ অভীমুখী নন - ফ্লবেয়ারের শিল্পপ্রাণতার অভিনিবেশী শিষ্য ছিলেন এই কারণে যে, অব্যর্থ রূপক, অব্যর্থ প্রতীক প্রয়োগে তাঁরাও ফ্লবেয়ারের মত স্থির লক্ষ্য খুঁজছিলেন। ফ্লবেয়ার যে একদিকে ইউরোপের সর্বাপেক্ষা প্রভাবশীল ঔপন্যাসিক সেটি সেই শিল্পপ্রাণতার দিক থেকে অনুধাবণযোগ্য। জয়েস ও লরেন্স উভয়ের বিপুল বৈপরীত্য সত্ত্বেও, সাদৃশ্য লক্ষণ বোধহয় এইখানে যে উভয়ে প্রতীকে এবং কাব্যের অনুশাসনে, উপন্যাসের শিল্পকর্মকে সমৃদ্ধ করতে চেয়েছেন। পৃথকভাবে দুজনে কাব্যচর্চা করেছেন এবং দুজনে উপন্যাসে দৃশ্যের অতীতকে ধরতে চেয়েছেন। লরেন্সীয় প্রতীক সে ক্ষেত্রে লরেন্সের সহায়ক, জয়সের গদ্যের কাব্যকল্প অবিচলতা তাঁর বিষয়ের বাহন। সুতরাং দেখা গেল যত দিন যেতে লাগল তত formal - realism এর শক্তিমান গদ্য মাধ্যমবিষয়গত বাস্তবতার দায় পরিহার করে, বিষয়ের অতীতে বা স্বরূপে পৌছনোর জন্য কাব্যের দ্বারে প্রার্থী হতে থাকল। উনিশ শতকের শেষ দিকে যখন থেকে social disinegration ধীরে ধীরে অনুভূত হয়েছে, তখন থেকে উপন্যাসে ফর্মে গদ্যের বস্তু-লক্ষ্য, ঋজু আনুশাসন অপেক্ষা কাব্যের আবহাওয়া ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়েছে। উপন্যাস-সাহিত্য জীবনের নিকটতম শিল্পকলা বলে উপন্যাসের প্রসঙ্গে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। জাতির জীবনের চিত্রকলা, কাব্যধারা অর্থাৎ জীব-বিষয়ক সমকালীন সমস্ত কিছু থেকেই উপন্যাস নিজের প্রাণ বায়ুর কিছু অংশ সংগ্রহ করে থাকে। 'জীবনস্মৃতি'-তে তিনি স্বীকার করেছেন যে, এই সময়ে গদ্য পদ্য যা লিখতেন 'তার মধ্যে বস্তু যেটুকু ছিল, ভাবুকতা ছিল তাহার চেয়ে বেশী।' তার বহু পরে জীবনের প্রান্তিক সীমানায় এসে 'বউ-ঠাকুরানীর হাট'-এর ভূমিকায় (১৯৪০) দাবী করেছেন — 'অন্তর্বিষয়ী ভাবের কবিত্ব থেকে বহির্বিষয়ী কল্পনালোকে .....মন যে প্রবেশ করলে এ বোধহয় কৌতূহল থেকে।' কবি যে জীবনদৃষ্টিকে 'বহির্বিষয়ী' বলে চিহ্নিত করেছেন, আসলে তা হচ্ছে 'বনফুল', 'কবিকাহিনী', 'সন্ধ্যাসঙ্গীত'-এর কবির রোমান্টিক, কুয়াশাময় বাতাবরণে প্রতিফলিত এক ধূসর ক্যানভাসে অঙ্কিত চিত্ররূপ।

প্রাক্-রবীন্দ্রযুগে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের গঠন-শরীরে রবীন্দ্রনাথের কাব্য নদীর মতোই ঘটেছে নানান পট পরিবর্তন। 'বিষবৃক্ষ', 'চন্দ্রশেখর', 'রজনী', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' — প্রতিটি উপন্যাসের মধ্যেই রয়েছে কাব্যনদীর বহতা, পরিবর্তনের ধারা। চারটি উপন্যাসেই কল্পনার

বৈচিত্র্যময় স্বতন্ত্রতা চোখে পড়ে। নারী, পুরুষ সম্পর্কের নতুন ভাবনা, বঙ্কিমের 'রজনী'-তে প্রকাশিত হয়েছে বৈজ্ঞানিকের নির্মোহ দৃষ্টিতে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে শরৎচন্দ্র স্মৃতি বক্তৃতায় মোহিতলাল মজুমদার প্রদেয় বক্তব্যে (১৯৫৫) তিনি 'রজনী' উপন্যাসটি সম্পর্কে বলেছিলেন — "'রজনী'-র মূল আখ্যায়িকাটিকে একখানি গীতিকাব্য বলিলেও হয় — Psychological, Subjective, Lyrical. কুন্দনন্দিনীর সেই লিরিক প্রেম আর একরূপে কবিকে আবিষ্ট করিয়াছে।....." এছাড়া রবীন্দ্রপ্রাক্ বা সমসাময়িক যুগে রমেশচন্দ্র দত্ত-এর উপন্যাসে বঙ্কিমের ব্যর্থ অনুকরণ, প্রতাপচন্দ্র ঘোষের ঐতিহাসিক তথ্যের বুনন, সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের গৃহিণীপনার অভাব, হতে ইন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের ব্যঙ্গের বাতাবরন সৃষ্টি, তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সমাজ বাস্তবতার বিভ্রম উপন্যাস আর কাব্যের জগতকে পৃথক করে দিয়েছে। দামোদর মুখোপাধ্যায়ের উপন্যাসে বঙ্কিম প্রভাবে স্থূল ও বিকৃত রূপ পাওয়া যায়। শিবনাথ শাস্ত্রীর উপন্যাসে ধর্মপ্রচারের আহত জীবন অভিজ্ঞতা, চন্ডীচরণ সেনের ঐতিহাসিক নিষ্ঠা, হরপ্রসাদ শাস্ত্রির উপন্যাসে ইতিহাসের বাঁক ফেরা শিল্প, যোগেন্দ্রচন্দ্র বসুর ক্রুদ্ধ, ব্যঙ্গের মেজাজ, ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাঘ-মানুষ-ভূতের রাজ্যে পরিক্রমণ, নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতার সন্ধান, শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের অতীত বাংলা ও বাঙালীর রূপরেখা, হরিসাধন মুখোপাধ্যায়ের রঙমহলের নেশার রেশ কখনোই কী বিষয়ের দিক থেকে, কী প্রকরণের দিক থেকে কাব্যের ফসলি জমি তৈরিতে সমর্থ হয়নি। এ সময়েই স্বর্নকুমারী দেবীর 'কাহাকে' উপন্যাসটিতে কাব্য-সুরভিত শৈলীর নিদর্শন পাওয়া যায়। মীর মোশারফ হোসেনের 'বিষাদসিন্ধু' উপন্যাসটিও মহাকাব্যের মহিমা পেয়েছে।

রবীন্দ্র-উত্তর যুগে উপন্যাসে কবিত্বের ঝরাপাতা অনেক ঔপন্যাসিক তাদের সৃষ্টি ভান্ডারে সযত্নে রেখে দিয়েছেন। সময়, শ্রেণীর বিপ্রতীপ মেরুকরণে সেগুলি নতুনত্বের স্বাদ বহন করলেও কাব্যের আরোহণ-অবরোহণের মূলের শিকড় যে রবীন্দ্র-উপন্যাসের মৃত্তিকা গহ্বরে নিহিত ছিল তা বলাই বাহুল্য। বনফুলের 'মৃগয়া', জীবনানন্দ দাশের 'কল্যাণী', 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'বিরাজ' প্রভৃতি উপন্যাস যেন কবিকন্যা মঞ্জুশ্রী দাশের পিতৃ স্মৃতি চারণে মুখবন্ধ হয়ে ওঠে :

"তাঁর প্রকাশভঙ্গী ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনেকটা জাপানি কবিতার মতো।"[৪] কবিতার ক্ষেত্রে সেই জীবনানন্দকে আমরা যেমন পাই, কথাসাহিত্যেও সেই কবি-আত্মাকেই খুঁজে পাই। জয় গোস্বামীর 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল' এক অখন্ড কাব্যোপন্যাস ; এভাবেই আধুনিক থেকে উত্তর আধুনিকের পথে শতবর্ষের ওপারে এবং এপারেও উপন্যাসে-কবিত্ব যেন এক পোষ্ট-মডার্ন আর্ট হয়ে উঠেছে।

উল্লেখপঞ্জী

১. Sylva Norman, The Great Victorians 1, Pelican Edition, 1937
২. E. M. Forster, Aspects of the Novel, London, 1953, P-9
৩. অতুলচন্দ্র, কাব্যজিজ্ঞাসা, কলিকাতা, ১ম সং, ১২২৮,পৃ-৫৪
৪. একদিন শতাব্দীর শেষে, জীবনানন্দ স্মারক সংকলন, পশ্চিমবঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি